WALL MAGAZINE OF 2023

ON THE OCCASION OF WORLD PHILOSOPHY DAY

DEPRTMENT OF PHILOSOPHY

বর্তমান যুগে মূল্যবোধ আত্মকেন্দ্রিক

মূল্যবোধ কথাটির প্রতিশব্দ হলো "value"। কোনো ব্যক্তির পরিচিত বা নিজের আয়ত্তে যা কিছু আছে, তার মধ্য থেকে অধিকতর মূল্যবান হিসাবে যা কিছু সঞ্চয় করতে চায়, তা থেকে মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে বলা যায় মানুষের আচরণ, মনোভাব প্রভৃতি বিষয়ের মানদন্ডকে মূল্যবোধ বলে।

মূল্যবোধের উৎস গুলি হলো মূলত পরিবার , সমাজ , বিদ্যালয়,বন্ধুবান্ধব, ধর্ম, আত্মীয় স্বজন, বই ইত্যাদি।সারাজীবন আমরা প্রতি পদে পদে জীবনের মূল্যবোধ উপলব্ধি করি। জীবনের চাহিদা বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম, যেমন - কেউ চায় অর্থ, কেউ চায় জ্ঞান, কেউ ভক্তি বা প্রেম চায়। এই চাওয়ার কোনো শেষ থাকেনা।এককথায় এই চাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই।

সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করে। প্রত্যেকটি মানুষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল।পৃথিবীতে কেউ একা বাঁচতে পারে না। সবাইকে কোনো না কোনো ভাবে অপরের প্রতি নির্ভরশীল হতে হয়।

যখন একটা সমাজে মানুষের মধ্যে অপরের প্রতি চিন্তা থাকেনা, বিশ্বাস থাকেনা,ভরসা ভালোবাসা থাকে না, সব কিছুর মরণ ঘটে তখন মানুষ হয়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রিক। তখনই সমাজে নানা বিপর্যয় ও অবক্ষয় দেখা যায়।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় সর্বত্রই মূল্যবোধ এর চরম পতন ঘটেছে। মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য এমন কোনো কাজ নেই যা করছে না।পরিবারে ,সমাজে প্রতিটি মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস দানা বেঁধেছে। সামান্য কারণে একে অপরকে শাস্তি দিচ্ছে।এমনকি মানুষ তার প্রিয়মানুষকে হত্যা করতেও দুবার ভাবছেনা। অফিস,আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বত্রই চলছে অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা। সাম্প্রতিকালে প্রতিকা গুলোতে দেখা যায় প্রেমে প্রতরনারঅভিযোগে আত্মহনন, প্রেমিকাকে খুন, প্রেমিকাকে অ্যাসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি ঘটনাগুলি। মাদকের টাকা জোগাতে যুবকেরা চুরি, ডাকাতি করতেও ভাবে না।সমাজের বাস্তব চিত্র আজ এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এতে বোঝার উপায় নেই যে মানুষ সমাজে বাস করছে কিসের জন্য।

উপরিউক্ত ঘটনাগুলি থেকে বোঝা যায় যে বাস্তবে মানুষের মূল্যবোধ অত্যন্তই আত্মকেন্দ্রিক। মানুষ যা করছে তা শুধুমাত্র নিজের স্বার্থের জন্য, নিজের লক্ষ্যপূরণের জন্য ,নিজের সুখ শান্তির জন্য।কিন্তু প্রতিটি মানুষের উচিত বিকাশবোধকে জাগ্রত করা। মূল্যবোধের উন্নয়ন ঘটানো। আর এর জন্য নিজের থেকে বেরিয়ে অন্যদের গুরুত্ব দিতে হবে।

সংযুক্তা পাল

দ্বিতীয় বর্ষ

স্বধর্ম ও ধর্ম

ধর্ম কথার অর্থ হল দায়িত্ব বা কর্তব্য এবং স্বধর্ম কথার অর্থ হল নিজ দায়িত্ব বা কর্তব্য । মানুষ সমাজের নিয়ম কানুন মেনে চলে । কিন্তু মানুষ অনেক সময় অন্যের আচরণ বা কর্মকে মহৎতর বলে মনে করেন, নিজের কর্ম বা রীতিনীতিকে অপছন্দ করেন। এতে সেই ব্যক্তি নিজের দায়িত্ব বা কর্তব্যকে এড়িয়ে যায়। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভে যখন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন বিমর্ষ হয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিলে তার পরমমিত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম পালনের পরামর্শ দেন। শ্রীকৃষ্ণের মতে একজন ব্যক্তিকে নিজধর্ম বা দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়, বরং মনুষ্যের যেকোন পরিস্থিতিতে নিজ দায়িত্ব বা স্বধর্ম পালন ও রক্ষা করা উচিত, কারণ এটিই হল শাস্ত্রবিধিত কর্ম। বর্তমানের প্রতিটি মানুষেরও নিজ দায়িত্ব পালন করা উচিত, তা সে যেই হোক একজন লেখক, সাংবাদিক, পুলিশ কিংবা ডাক্তার, যার যা কর্ম তাতে যেকোন পরিস্থিতিতে অটল থাকা দরকার। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাগবত গীতায় যারা স্বধর্ম পালন করেন না তাদের পাপাচারী বলেছেন। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে একজন যোদ্ধা যদি পঠনপাঠন করতে শুরু করলে সেটি কখনও শোভা পায় না ।

গৌরব দত্ত

প্রথম বর্ষ

কর্মই জীবন

আমরা যা করি তাই আমাদের কর্ম। আক্ষরিক অর্থে প্রাণীকুল কর্ম না করে থাকতে পারে না। কেননা শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়াও একপ্রকারের কর্ম। তাই কর্মের পরিসর বা ব্যাপ্তি প্রায় অনন্তই। জীবনের স্তরে স্তরে মানুষের কাছে কর্মের ব্যাপ্তি বা অর্থ পরিবর্তিত হতে থাকে।মানুষের চিন্তন, তার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, শিক্ষা , পারিপার্শ্বিক পরিমন্ডল তার কর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সর্বোপরি, কর্ম ব্যক্তির চরিত্রকে প্রতিফলিত করে।আমাদের বেশীরভাগ কর্মই আমরা স্বইচ্ছায় করি। আর যেকাজ আমরা নিজেদের ইচ্ছায় করি তার দায় তো আমাদের উপরই বর্তাবে। তাই ভালো কর্ম করলে আমরা প্রশংসিত হই ,আর খারাপ বা মন্দ কর্ম করলে আমরা নিন্দিত হই। তবে কর্মফল লাভ বা নির্ধারণের সঙ্গে মানদন্ডের অবশ্যই সম্পর্ক আছে। সেই মানদন্ড বৃহত্তর পরিসরে সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মানদন্ড হতে পারে।আমাদের স্বেচ্ছাকৃত কর্ম সাধারণভাবে কোন না কোন উদ্দেশ্যকেই চরিতার্থ করে অর্থাৎ ফলের আশা করেই আমরা কর্ম করি, যা সকাম কর্ম।এধরণের কর্ম ব্যতিরেকে আর একধরনের কর্ম হল নিষ্কাম কর্ম, যা নিঃস্বার্থভাবে অর্থাৎ ফলের আশা না করে সম্পাদন করা হয়।গীতায় নিষ্কাম কর্মের কথা বলা হয়েছে।ভারতীয় দর্শনানুসারে এই নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মোক্ষ অর্থাৎ চিরতরে দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব।আমরা যারা সাধারণ মানুষ তাদের পক্ষে কি নিষ্কামভাবে অর্থাৎ সকল কামনাবাসনা বিযুক্ত হয়ে কর্ম করা সম্ভব? শাস্ত্রানুসারে সম্ভব। কিন্তু কিভাবে? নিষ্কাম কর্ম করতে গেলে প্রথমেই আমাদের কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করতে হবে অর্থাৎ "আমি এই কর্মের কর্তা"রূপে যে আমার অহংকার তাকে ত্যাগ করতে হবে।এই অহংকার ত্যাগ করা তখনই সম্ভব যদি ভালো- মন্দের প্রতি সমত্ব বুদ্ধি থাকে অর্থাৎ জীবনে যাই ঘটুক তাকে শান্ত মনে ,স্থিরভাবে আবেগমথিত না হয়ে গ্রহণ করতে হবে। এমন স্থিতধী হয়ে তিনিই কর্ম করতে পারবেন ,যিনি বিশ্বাস করেন কর্মের কর্তা তিনি নন , তিনি নিমিত্তমাত্র , তাই কর্মের ফল প্রাপ্তির অধিকারী তিনি নন।নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করে যাওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য।তাই কর্মে অকর্ম দর্শন এবং অকর্মে কর্ম দর্শনই আমাদের অভীষ্ট । দৈনন্দিন জীবনে ছোট ছোট পরিসরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগের অনুশীলন হয়ত বা এই দুরূহ পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের সাহায্য করবে।

অধ্যাপিকা শম্পা বসু

বর্তমান পরিস্থিতিতে গণমাধ্যমের দায়িত্ব পালনে ভূমিকা

মহাকালের রথের চাকা কখনো থামে না।সে চলে এগিয়ে চলে।সুন্দর কলায় তার জীবনের ধারা।এককালে লোকশিক্ষার যে প্রচার প্রসার ছিল তার পরিবর্তন চারদিকে দিকে শুরু হয়েছে বিজ্ঞান এর জয়যাত্রা।মানুষ পৌঁছে উঠেছে অনাবিষ্কৃত জগৎ এর রহস্য সন্ধানে।এক এক মানুষ আরও করেছে আনন্দের নানা উপকরণ।নতুন গণমাধ্যম এসে দখল করল পুরানো গণমাধ্যমের জায়গা।বিজ্ঞান মানুষ এর হাতে তুলে দিল সংবাদপত্র,রেডিও,টেলিভিশন,চলচ্চিত্র।এগুলোই হলো আধুনিক যুগের আধুনিক গণমাধ্যম।

মিডিয়া অর্থাৎ মাধ্যম যার মাধ্যমে আমরা সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে কিছু জানতে পারি।এখন সেই মাধ্যমটির কোন নীতিগুলি অবশ্যই পালনীয় তা আলোচনা হয় media ethics-এ।আমাদের জীবনে বৃহত্তর অংশ জুড়ে রয়েছে media,তা সে সোশাল মিডিয়া হোক বা খবরের কাগজ হোক।তাই এই মাধ্যমগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ নিয়মনীতি মেনে চলতেই হবে।তা নাহলে মানুষ তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে ভুল পথে চালিত হবে।

আধুনিক গণমাধ্যম ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের কিছু ভূমিকা আছে সেগুলি হল-

- বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের আলোতে শিক্ষা-বিস্তারে বিশিষ্ট কয়েকটি 'mass media' বা গণমাধ্যম আমাদের বিশেষ সহায়ক হতে পারে।এসব গণমাধ্যমগুলো হচ্ছে সংবাদপত্র,রেডিও, টেলিভিশন ও সিনেমা।
- শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল জনগণকে জাতীয় চেতনা ও দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত করা।দেশদ্রোহী বিভিন্ন শক্তি ও অপসংস্কৃতি বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে অনন্য ভূমিকা রাখে গণমাধ্যম।পাশাপাশি এটা দেশের জন্য ক্ষতিকর।বিভিন্ন তথ্য ও   ভুল ধরে।এজন্য বলা হয়েছে- "freedom and sovereignty of people is dependent on mass media"।
- গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতা থাকে জনগণের হাতে,ফলে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও ভূমিকা জাতীয় অগ্রগতির পক্ষে কতটা সহায়ক এবং কতটা জনস্বার্থে পরিপূরক তা নিয়ে জনগণের মধ্যে অনেক সময় দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা যায়।কিন্তু,সংবাদপত্র উভয় পক্ষের মতামত,যুক্তি ও তথ্য নিয়ে আলোচনা প্রকাশ করে।বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে নিজেদের অভিমত গঠন করতে পারে।
- সিনেমা সাংস্কৃতিক বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।দেশে সিনেমার দর্শক প্রচুর।সিনেমাতে যাতে অশ্লীল ও উগ্র পোশাক ব্যবহৃত না হয়ে তার প্রতি কর্তৃপক্ষের(ফিল্ম সেন্সর বোর্ড)নজর রাখা উচিত।তবেই সেই মাধ্যমগুলির যা মাধ্যমগুলোই সেই চলচ্চিত্রগুলি দেখাচ্ছে,তাদের নৈতিক পালন যথাযথ হবে।
- মানুষের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে গণমাধ্যম প্রত্যক্ষ ভূমিক পালন করে।ফলে গণমাধ্যমে মানুষের ইতিবাচক পরিবর্তনের বিষয়গুলি বেশি প্রচার হওয়া উচিত।
- তাদের উচিত নিজেদের সাংস্কৃতির উজ্জ্বল দিকগুলোকে আরও উজ্জ্বল করে তোলা।অনুকরণ নয়,অনুসরণ করে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমৃদ্ধ করতে হবে।

সবশেষে বলা যায়,বর্তমানে গণমাধ্যমসমূহ কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অসফল হচ্ছে।

শিল্পা ঘোষ

প্রথম বর্ষ

শিক্ষায় সংস্কারে মানব দর্শন : দর্শন চর্চা ও চর্যা

বিস্ময়ী কৌতূহলী মানব মনের জ্ঞানান্বেষণে, সত্যানুসন্ধানে এবং অজানাকে জানার প্রচেষ্টাসহ ব্যবহারিক জগতের বিচার বিশ্লেষণমূলক সমস্যার সমাধানে বিষয় দর্শন তার সুবিস্তৃত পরিসরে এই পার্থিব জগতে মানব সমাজের সকলের প্রতিই দায়বদ্ধ । দর্শনের এইরূপ দায়বদ্ধতা কেবল ব্যক্তির জ্ঞানান্বেষণ কিংবা সত্যানুসন্ধানের পরিসরেই নয় বরং তার শিক্ষায়, রুচিবোধের গঠনে এবং সংস্কারেও। বলা যায়, একজন ব্যক্তি মানুষের সর্বাত্মকরূপে মানুষ হয়ে ওঠার মূলেই দর্শন সর্বদাই মূল ভূমিকা গ্রহণ করে । যদি প্রশ্ন হয় , কীরূপে দর্শন এই ভূমিকা পালন করে? তবে উত্তরে এর উপযোগিতামূলক প্রসঙ্গের আলোচনা আবশ্যিক হয়ে পড়ে ।তবে তারও আগে যা প্রয়োজনীয় তা হল, দর্শনের পরিসরে বিবিধ শাখার উল্লেখসহ এর গুরুত্ব নির্ধারণ । বিষয় দর্শন তার তত্ত্ব ও পদ্ধতিগত আলোচনার পরিসরে মূলতঃ যে দুটি দৃষ্টিভঙ্গিতে ধরা দেয় তাহল, প্রাচ্য (ভারতীয়) এবং পাশ্চাত্য। তবে এমন নয় যে, কেবল এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গিতেই দার্শনিক তত্ত্বের উল্লেখ মেলে । বরং রাষ্ট্রদর্শন, ধর্ম ও সমাজদর্শন, নীতিদর্শন, মনোদর্শনসহ যুক্তিশাস্ত্র নামক এর বিবিধ শাখাতেও উল্লিখিত অসংখ্য তাত্ত্বিক আলোচনা এবং এর প্রায়োগিক পরিসর সমানভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ । প্রতিটি শাখার পরিসরেই দার্শনিক আলোচনা তার সত্যদৃষ্টি ও বিচার - বিশ্লেষণী নিরিখের আঙ্গিকে আলোচিত হয় । আর এইরূপ সামর্থ্যেই সমর্থ হয়ে একজন দার্শনিক কিংবা একজন পাঠক কিংবা একজন অনুশীলক যেকোন বিষয়কে তার প্রকৃত স্বরূপে, কোন সমস্যাকে তার মূল উৎস থেকে চিহ্নিত করে তার বাস্তব সমাধানে প্রবৃত্ত হন । তাই দর্শনে জাগতিক বা পার্থিব বিষয়ের তুলনায় অপার্থিব কিংবা অতিজাগতিক বিষয়ের প্রতিই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় তাই এর আলোচনা ও অনুশীলন অপ্রয়োজনীয়, এমন দাবী করা যায় না । প্রশ্ন হয়, এইরূপ বিচার - বিশ্লেষণী সামর্থ্য যদি কেবল একজন দার্শনিকেরই হয় তবে এর বিশ্বজনীনতার স্বার্থকতা কোথায় ? সেক্ষেত্রে এইরূপ সামর্থ্য কি একে সীমিত করে তোলে না ? উত্তরে বলা যায়, একজন দার্শনিক এইসকল সামর্থ্যের অধিকারী হন একথা সত্য হলেও তা একমাত্র সত্য নয় । বরং এর অনুশীলকেরও এইরূপ সামর্থ্যের অধিকার আছে । কীভাবে ? দুঃখের নিবৃত্তি এবং সুখের ভোগই হল সকল মানবজীবনের একমাত্র অভীষ্ট । এই সুখ যেমন পার্থিব বা জাগতিক বিষয় সংক্রান্ত হতে পারে তেমনই আবার অপার্থিব বিষয়কেন্দ্রিকও হতে পারে । অপার্থিব বিষয়কেন্দ্রিক সুখের অন্বেষণ যেহেতু আধিবিদ্যক দার্শনিক আলোচনা , তাই দর্শনের বিশ্বজনীনতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তা বর্তমান আলোচনার পরিসরের বাইরেই থাকছে । পার্থিব জগতের সুখান্বেষণে অতিমাত্রায় পিপাসু ব্যক্তি যে বহুক্ষেত্রেই প্রয়োজনে অথবা অপ্রয়োজনে অসংযত, অনিয়ন্ত্রিত, রুচি ও সংস্কারহীনতার পরিচয় রাখেন তা অস্বীকার করা যায় না । বলা বাহুল্য এইসকল ব্যক্তিমনের অন্ধকার কেবলই স্বার্থসংকীর্ণতাক্লিষ্ট । যা তাদের মনন, চিন্তন এবং অবশ্যই মানবিকতাবোধেরও প্রতিবন্ধক ।এইসকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে প্রয়োজন চাহিদার সীমায়িতকরণ । ব্যক্তি চাহিদা, তা সে শারীরিক হোক কিংবা মানসিক, তা পূরণের লক্ষ্যে ব্যক্তি কখনোই অপরকে বঞ্চিত করবেন না, তাকে আঘাত করবেন না কোনরূপ হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করবেন না, এবং এর মধ্যে দিয়েই নিজেও সানন্দে সর্বাঙ্গীন সুখের আস্বাদ গ্রহণ করবেন, তার মধ্যে দিয়েই তো প্রতিষ্ঠিত হবে প্রকৃত মানববোধ । না, এর জন্য সেই অর্থে কেবলই যে প্রথাগত শিক্ষার কিংবা দার্শনিক তত্ত্বের চর্চার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এমন নয়, বরং যা প্রয়োজন তাহল, তার আন্তরিকতা, সহৃদয়তা, রুচিবোধ এবং সংস্কারের । যা একান্তভাবেই ব্যক্তির স্বরূপ বা স্বভাবগত । এইরূপ স্বভাববৃত্তির অনুশীলনের মধ্যে দিয়েই ব্যক্তি যেমন নিজে প্রকৃত অর্থে মানববোধের পরিচয় দিতে পারেন তেমনি অপরকেও এইরূপ অভ্যাসে উৎসাহিত করেন । আর তার মধ্যে দিয়েই অজ্ঞাতেই অনুশীলিত হয়, সত্যদৃষ্টি, বিচার - বিশ্লেষণী নীতিবোধ, যুক্তির যথার্থতা, নিরপেক্ষতা, আদর্শ মানদণ্ডের নিরিখে সমাজ-রাষ্ট্র ও ধর্মবোধ, কর্তব্যানুসারী অহিংসাদর্শ, সবিচার চিন্তন সামর্থ্য ইত্যাদি নানাবিধ দার্শনিক তত্ত্ব । মানব মনের এইরূপে পূর্ণবিকাশ সাধনের মধ্যে দিয়েই ব্যক্তির কর্মে ,চিন্তায় এবং মননে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য ; চরিতার্থতা পায় বিশ্বমানবদর্শন । তাত্ত্বিক আলোচনা না হলেও এইরূপ ব্যবহারিক প্রয়োগে দর্শন চর্চা ও চর্যা তুলনায় কম কীসে _

অধ্যাপিকা
সুদীপ্তা সামন্ত

বর্তমান পরিবেশে মানবাধিকারের প্রাসঙ্গিকতা

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১০ ই ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে মানবাধিকার আইন পাশ হবার পর সারা পৃথিবীর মানুষের জীবনে মানবাধিকার ধারণার পরিচয় ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সকল নেতৃবর্গকে শিহরিত করে এবং তারপর থেকেই মানবাধিকার আইন তৈরি হয় আর তাতে বিশ্বের সকল নেতারা স্বাক্ষর করেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে , মানবাধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে যা বিশেষভাবে মনোযোগের দাবি রাখে। মানবাধিকারের ধারণা সাম্য,স্বাধীনতা, ন্যায় ইত্যাদির মতো পাশ্চাত্য ভাবধারা থেকে উদ্ভূত।

এই মানবাধিকারের পূর্বে তিনটি অধিকার ছিল। যেমন - প্রাকৃতিক অধিকার, মানুষের অধিকার, সুন্দর সমাজের অধিকার। যদিও এই ধারণার ঐতিহাসিক উৎস হিসেবে প্রাচীন গ্রিক ও মধ্যযুগকে চিহ্নিত করা হয়।

মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্যগুলি হল-

- সমাজের সদস্য হিসেবে প্রতিটি মানুষ এই অধিকার ভোগ করে থাকে।
- অধিকার ব্যক্তির বিকাশের জন্য অপরিহার্য।
- রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ করে।
- ব্যক্ত তার অধিকার কেমন ভাবে প্রয়োগ করবে, জাতি সামাজিক কল্যাণে সাধিত হয়।
- অধিকার প্রয়োগের সময় প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্য ধর্ম সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।
- অধিকার কখনো অবাধ হতে পারে না। সামাজিক কল্যাণ, সামাজিক শৃঙ্খলা, জনস্বার্থ বা নিরাপত্তাজনিত কারণে নাগরিকদের অধিকারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়।
- অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর সম্পর্কিত তাই কর্তব্য সম্পাদন ছাড়া অধিকার ভোগ করা যায় না।

সাধারণ অধিকার মূলত নৈতিক অধিকার হলেও এগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানে স্থান পেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা পেয়েছে। এই অধিকারগুলি হল যথাক্রমে –

- স্বাধীনতার অধিকার
- শিক্ষাগ্রহণের অধিকার
- পৌর বা নাগরিক অধিকার
- মতামত প্রকাশের অধিকার
- সম্পদের অধিকার
- ধর্মাচরণের অধিকার

এই অধিকারগুলো বর্তমান জীবনে একজন সাধারণ মানুষ স্বইচ্ছায় সম্পূর্ণভাবে ভোগ করতে পারে না। কারণ –

- স্বাধীনতার অধিকার এমন একটি অধিকার যা একজন সাধারণ নাগরিক কখনো সুষ্ঠু ভাবে পালন করতে পারে না। কারণ স্বাভাবিকভাবে প্রতিশোধ বা শাস্তির ভয় ছাড়াই ব্যক্তিদের মতামত প্রকাশের ক্ষমতা থাকলেও বহিরাগত কিছু কারণে বাধা সৃষ্টির জন্য তারা নানা সমস্যার সম্মুখিন হয় ফলে তারা নিজেদের মত প্রকাশে ব্যর্থ হন।
- শিক্ষার অধিকার এমন একটি অধিকার যেখানে ৬ বছর থেকে শুরু করে ১৪ বছর পর্যন্ত প্রত্যেকটি শিশুকে বিনামূল্যে শিক্ষা দান করার কথা বলা হয়েছে। এই অধিকারটি বর্তমান পরিবেশে শিশুদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- চুক্তির অধিকারে বর্তমান পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্বাধীনভাবে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই সমাজে সেটি সম্পূর্ণভাবে সফল হয় না। কারন যখন কোনো রাজনৈতিক বিষয়ের প্রসঙ্গ উঠে আসে তখন একটি উচ্চবর্গের মানুষ যে পরিমাণ সুযোগ সুবিধা ভোগ করে একজন নিম্নবর্গের মানুষ সেই পরিমাণ সুযোগ সুবিধা কখনো ভোগ করে উঠতে পারে না।

এছাড়াও ১৮ বছর বয়সের পর আমরা যে অধিকার ভোগ করে থাকি সেটি হল ভোটাধিকার। সেখানে স্বাধীন ভাবে ভোট দান করার প্রসঙ্গ উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আমরা সেই অধিকারটি নিজের মত অনুসারে ব্যবহার করতে পারি না। কারন ভোটদানের সময় কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মগত বিষয়ের দিক থেকেও চাপের সৃষ্টি হয়। ফলে বর্তমান পরিবেশে একজন সাধারণ নাগরিক নিজের মত অনুযায়ী কাজ করতে পারে না।

সুস্মিতা হালদার, প্রথম বর্ষ

বৌদ্ধ ধর্ম : মানব কল্যাণের দর্শন

বৌদ্ধ ধর্মের মহান পথপ্রদর্শক গৌতম বুদ্ধ অহিংসা,নির্লোভ, ক্ষমা এবং প্রেমের বাণী প্রচার করেছেন। বুদ্ধর মতে, মৈত্রী হচ্ছে সবপ্রাণীর প্রতি কল্যাণ কামনায় ব্রতী হওয়া। মৈত্রীর সংজ্ঞায় বলেছিলেন, 'মা যেমন তার স্বীয় একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে বিপদ থেকে রক্ষা করে, তদ্রুপ সব প্রাণীর প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রী প্রদর্শন করবে।' এ মহামৈত্রীই শত্রুকে মিত্র, দূরের মানুষকে কাছে আনার ধারক ও বাহক। এটাই বিশ্বভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে সৌহার্দ্য ও নৈকট্য গড়ে তোলার চাবিকাঠি। এতে মানুষের সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা বিদূরিত হয়। জাতীয় সংহতি বিধানে ও বৈশ্বিক সম্পর্ক উন্নয়নে মহামৈত্রী এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই মানুষের প্রতি গৌতম বুদ্ধের অমর অবদান 'বিশ্বমৈত্রী'। এই বিশ্বমৈত্রী কিন্তু শ্রেণী বা সম্প্রদায়গত নয়। সর্বজনীন মানবধর্ম রূপেই স্বীকৃত।

হিংসা-দ্বন্দ্ব যুক্ত সমাজের বিপরীতে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নির্মাণে মৈত্রীময় চেতনাকে স্থাপন করার কথা বলেছেন বুদ্ধদেব।সৃষ্ট জগতকে খন্ড খন্ড করে নানা দেশ, নানা জাতি হিসেবে দেখার নাম যে মানবতা নয়, তা উপলব্ধি করে বুদ্ধ বলেছিলেন, সমস্ত বিশ্ব ও প্রাণময় জগতকে অখন্ড হিসেবে দেখার নামই মানবতা। মানুষ মাত্রই সমান। গৌতম বুদ্ধ চেয়েছিলেন, "তুমি যেমন সুখে থাক,অপরকেও সুখে থাকতে দাও।"

অধ্যাপিকা মৌমিতা পাঠক।

চার্বাকদের প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করার বিষয়টি দৈনন্দিন কাজ কর্মের সঙ্গে কতখানি প্রাসঙ্গিক

ভারতীয় দর্শনে যথার্থ জ্ঞান কে "প্রমা" বলা হয়। এবং যথার্থ জ্ঞানের উপায়কে বলা হয় "প্রমাণ"। চার্বাক মতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন সম্ক অপরক্ষ অনুভব হলো প্রত্যক্ষ অনুভব হলো ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা ইন্দ্রিয় সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষ জনিত অনুভবই প্রত্যক্ষ।

তাদের মতে অনুমান ও শব্দের দ্বারা কোন নিঃসন্ধিত ও যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায় না চার্বাক পন্থীরা বলেন যা ইন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ লব্ধ নয় তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যে বস্তুকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায় এবং অনুভব করা যায় একমাত্র সেই বস্তুরী অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় । কারণ হিসাবে বলেছেন প্রত্যককে ছাড়া অনুমান হয় না , শব্দ শ্রবণ না করলে শব্দের অর্থ জানা যায় না, প্রত্যক্ষ ছাড়া উপমান – উপমেয় ভাব চিন্তা করা যায় না তাই প্রত্যক্ষ ছাড়া উপমান, অনুমান ,শব্দ স্বীকার করা যায় না।

কোন প্রমাণের জ্ঞানের সংশয় থাকলে তা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা দূর করা যায়।প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভুলভাবে স্বীকৃত হতে পারে না।জ্ঞান লাভের জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর ভরসা রাখা যায় এবং সফল হওয়া যায়।প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলে দৈনন্দিন জীবনে আবার মানুষ কোন জ্ঞানের ওপর ভরসা রাখতে পারে না। আর এর জন্যে বর্তমান দৈনন্দিন পরিস্থিতিকেই দায়ী করা যায়।প্রত্যক্ষ কে স্বীকার করলে সেই জ্ঞানে কোন সংশয় বা ভ্রান্তি থাকে না।কিন্তু প্রত্যক্ষ না থাকলে সংশয় বা ভ্রান্তি থাকতে পারে।

তাই, চার্বাকদের মতে প্রাধান্য বর্তমান জীবনে অধিক। তবে অনুমান বা শব্দকে পুরোপুরি ভাবে অস্বীকার করলে অনেক বাধা ও সম্মুখীন হতে হবে কারণ, এর উপর নির্ভর করেও আমরা অনেক কাজকর্ম করি।।

স্নেহা দে

প্রথম বর্ষ

পরিবেশ ও নৈতিকতা

পরিবেশের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা অসীম, কারণ আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই পরিবেশ থেকে সংগৃহীত হয়।

নৈতিকতা হলো ভালো,মন্দের পরিমাপ ও সংবরণ বা সংযম। যা আমাদের আদর্শ, মর্যাদা, মানবিকতা ও নৈতিক মূল্যের সাথে সম্পৃক্ত।

এক্ষেত্রে দুটি প্রশ্ন উত্থিত হয়- প্রথমত, পরিবেশের ক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রয়োজন কোথায়? দ্বিতীয়ত পরিবেশের যে সম্পদ গুলোকে আমরা ভোগ করছি সেই ভোগের ক্ষেত্রে আমাদের আদৌ কি কোথাও নৈতিক হওয়ার প্রয়োজন আছে?

এর সদুত্তরে বহু নীতিবিদগণ বলেন, পরিবেশের স্বার্থেই নৈতিকতাকে পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করা আবশ্যক।পরিবেশকে নৈতিক নিয়ম নীতির মাধ্যমে পরিচালনার ফলে এটি সামাজিক পরিবেশকে সৃজনক্ষম করে তোলে, প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করে, মানবকূলসহ অন্যান্য প্রাণী জীবনকেও সংহত রাখে ও ভবিষ্যতের প্রজন্মকে সুরক্ষা দেয়। এছাড়া নৈতিকতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা পরিবেশে ব্যক্তি মানুষকে তার সামাজিক সম্পর্ক ও সম্মান বাড়াতে সাহায্য করে এবং একটি সাম্প্রদায়িক ও পরিচালনামূলক বাস্তবায়ন তৈরি করে। পরিবেশ সম্পর্কে উপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে ও পরিবেশ সংরক্ষণে সাহায্য করে নৈতিকতা, যার উপর ভিত্তি করেই পরিবেশ কেন্দ্রিক নৈতিকতার ধারণা গড়ে উঠেছে।

এই পরিবেশকেন্দ্রিক যে নৈতিকতা তার মূল উদ্দেশ্য হলো যে,বর্তমান ও ভবিষ্যতের মানুষ যাতে প্রাণীকুলের স্বার্থে পরিবেশের সঙ্গে নৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে দৈনন্দিন জীবনকে পরিচালনা করতে ও সংরক্ষণ করতে পারে।সেই অনুযায়ী মানুষকে গড়ে তোলা এবং সব থেকে বেশি যেটি প্রয়োজন সেটি হল শুধুমাত্র বেঁচে থাকা ও আশ্রয় এর জন্য পরিবেশের ওপর করা শোষণ ও অপব্যবহারকে বন্ধ করা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষের সৌন্দর্যবোধ চরিতার্থ করার জন্যই পরিবেশকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন যা নৈতিকতাবে সম্ভব।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে পরিবেশ সংরক্ষণ কি কেবল মানুষের দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োজন সাধনের জন্য মূল্যবান?

এর সদুত্তর দেওয়ার পূর্বে মূল্য শব্দটির অর্থ অনুধাবন করতে হবে। মূল্য শব্দটিকে আমরা সাধারণত দুটি দিক থেকে বিচার করে থাকি,যথা-স্বতঃ মূল্য ও পরতঃমূল্য। যে বস্তু নিজে নিজেই ভালো, নিজ গুণেই সমৃদ্ধ ,তাই হল স্বতঃ মূল্য ,পক্ষান্তরে যে বস্তু অন্য কোন উদ্দেশ্য লাভে সহায়ক হয়, অপরের কোনো কাজের ওপর তার মূল্য নির্ভর করে তাই হলো পরতঃমূল্য।

পরিবেশকে স্বতঃ মূল্যবান বলেই গণ্য করা হয় কারণ সে নিজেকে তার অমোঘ নিয়মের দ্বারা পরিচালিত করতে পারে। ফলত তার মূল্য সে নিজেই তৈরী করতে সক্ষম। অপরপক্ষে পরিবেশকে পরতঃ মূল্যবান ও বলা হয় কারণ মানুষ ও মনুষ্যত্তর প্রাণীর প্রয়োজনার্থে পরিবেশ ব্যবহৃত হয় সেক্ষেত্রে সে অন্যের জন্য ইষ্টসাধে সক্ষম এবং তবেই সে মূল্যবান হয়। এই উভয় মূল্যের স্বীকৃতি লাভ করার জন্য পরিবেশকে নৈতিকতার মাধ্যমে পরিচালনা করা দরকার।

তাই পরিবেশ রক্ষার্থে "পরিবেশ" ও "নৈতিকতা" এই দুটি ভিন্ন ধারণার মধ্যে একটি মৌলিক সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন। সঠিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও নৈতিক আদর্শের মেলবন্ধন আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।কাজেই এক্ষেত্রে পরিবেশ ও নৈতিকতা পারস্পরিকভাবে সম্পৃক্ত।

রানু বিশ্বাস

প্রাক্তন ছাত্রী, দর্শন বিভাগ

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক সত্তা

'দার্শনিক' বিশেষণটি রবীন্দ্রনাথের উপর আরোপ করতে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত হন। কেননা এই বিশেষণটিতে নিজেকে বিশেষিত করতে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই তীব্র আপত্তি ছিল। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তেই ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর প্রধান এবং একমাত্র পরিচয় তিনি কবি। 'সাধক','ঋষি' ইত্যাদি পরিচয়েও তিনি পরিচিত হতে চাননি। তবে কি আমরা 'দার্শনিক' বিশেষণটি তাঁর উপর প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকব? উত্তরটি নিশ্চয়ই নেতিবাচক হবে। উপনিষদের মন্ত্র-শিষ্য রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের মর্মবাণীকে তাঁর অন্তরের গভীরে লালন-পালন করে যে বিশাল সৃষ্টির সম্ভার রেখে গেছেন, সেগুলোর দিকে বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর গভীর চিন্তাভাবনার যথার্থ ছবিটি ধরা পড়ে। অথচ তিনি বলেছিলেন— "তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোন অধিকার নাই। দ্বৈতবাদ-অদ্বৈতবাদের কোন তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর হইয়া থাকিব। আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়া বলিতেছি, আমার মধ্যে আমার অন্তদেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে -সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধি, মন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগত্, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে। এই লীলা তো আমি কিছুই বুঝিনা, কিন্তু আমার মধ্যেই নিয়ত এই এক প্রেমের লীলা।"" জগতে এই প্রেমময় সত্তার প্রেমলীলা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই পৃথিবীর জল-স্থল, অরণ্য-পর্বত, নদী-সমুদ্র, গ্রহ-নক্ষত্র—সর্বত্রই এই সত্তার নীরব উপস্থিতি তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল।জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনায় একজন দার্শনিক নিজেকে নিবদ্ধ রাখেন। রবীন্দ্রনাথ যে তার ব্যতিক্রম নন, এই চিত্র তারই প্রমাণ দেয়।

ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হ'ল মুক্তি সম্পর্কিত প্রশ্ন।

দুঃখ-দীর্ণ জীবন থেকে কিভাবে মুক্তি মিলতে পারে তার পন্থা নির্দেশও লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞান,ভক্তি ও কর্মমার্গ ভারতীয় দার্শনিকদের আবিষ্কৃত মুক্তি মার্গ।একজন ভারতীয় চিন্তানায়ক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ এই মার্গগুলির কোনটিকেই অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা না করে সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন। সর্বোপরি তিনি মুক্তির এক নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন যাকে নির্দ্বিধায় বলা যায় প্রেমমার্গ। জগৎ থেকে দূরে সরে পর্বতে,অরণ্যে বা নির্জন গুহায়,অথবা মন্দির,মসজিদ, গীর্জায় সাধনায় মগ্ন থাকলেই যে মুক্তি মিলবে না— এ ছিল তাঁর স্থির প্রত্যয়। আর তাই তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা।"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ ।।"

অধ্যাপক উত্তম মাইতি

Reincarnation

The "cyclicity of all life ,matter and existence" is a fundamental belief of most Indian religions. Reincarnation is also known as 'Metempsychosis' that is the philosophical or religious concept that the non-physical essence of a living being begins a new life in a different physical form or body after death according to biology. In that case of reincarnation many schools of philosophy are accept and spreading the theory that the soul of a human being is immortal and does not disperse after the physical body has perished. Upon death, the soul merely becomes transmigrated into a newborn baby to continue it's immortality. The theory of Indian philosophy tells that the pain of the new birth due to the karma of the previous birth should be done until we can just do action without thinking about the result of the action . In 'rebirth' according to 'Hinduism' , physical forms could be human, but may also be animal , plant or divine . A soul will complete the rebirth cycle many times , learning new thing each time and working though it's karma . Karma and reincarnation are closely tied. Reincarnation (Punarjanma) is a central tenet of the Indian religions such as Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism; although there are Hindu groups who do not believe in reincarnation, instead believing in a afterlife. A belief in the soul's rebirth or migration was expressed by certain 'Ancient Greek' historical figures , such as 'Pythogoras' , 'Socrates' , and 'Plato' . Although the majority of denominations within Christianity and Islam do not believe that individuals reincarnate . 'Samsara' is referred to with terms or phrases such as transmigration or reincarnation, karmic cycle and cycle of aimless drifting, wandering or mundane existence. The earliest layers of 'Vedic' period incorporate the concept of life , followed by an afterlife in heaven and hell based on cumulative virtues or vices . However, the ancient Vedic Rishis challenged this idea of afterlife as simplistic, because people do not live an equally moral or immortal life. Between generally virtuous lives , some are more virtuous; while evil too has degrees.

Pratyush Bain

1st semester

ভারতীয় দর্শনে ঋত

বৈদিক যুগে মানুষের নৈতিক জীবন যে দুটি নীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলো সামঞ্জস্যের নীতি (the principle of harmony) যাকে ঋত বলা হয়। বৈদিক যুগে মানুষের সমগ্র জীবনকে একটি যজ্ঞ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তপঃ বা তপস্যা, দান, আর্জব বা সরলতা ও সত্য বচনকে এই যজ্ঞের দক্ষিণা বলা হয়েছে। এই সময়ে মানুষের নৈতিক জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল এই ঋত-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে জীবন যাপন করা এবং তা সম্ভব ছিল যজ্ঞের মাধ্যমে।

আর্য সভ্যতায় সর্বশ্রেষ্ট জীবনাদর্শ বৈদিক 'ঋত' শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। বেদ একটি মহান নীতি স্বীকার করে যা সমগ্র বিশ্বকে পরিচালিত করে। এই নিয়ম হল ঋত ও সত্য-এর নীতি। যার দ্বারা বিশ্বজাগতিক নৈতিক শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় এবং দেবতা, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ও সমস্ত প্রাণী যে নিয়মের অধীন। প্রথমে 'ঋত' শব্দের দ্বারা প্রকৃতির একরূপতা বা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর যেমন, দিনের পর রাত্রির ও রাত্রির পর দিনের ব্যতিক্রমহীনভাবে আবির্ভাব বোঝাত, কিন্তু বেদের মন্ত্র ভাগে 'ঋত' শব্দের দ্বারা নৈতিক শৃঙ্খলাকেও (moral order) বোঝানো হয়েছে।বৈদিক সাহিত্যে বিবৃত হয়েছে ঈশ্বরীয় তপস্যার ফলে প্রথম উৎপন্ন তত্ত্ব হল ঋত বা সত্য। ঋগ্বেদে বলা হয়েছেঃ 'প্রজ্বলিত তপস্যা হতে ঋত অর্থাৎ যজ্ঞ এবং সত্য জন্মগ্রহণ করল'। এর তাৎপর্য হল যে, বিশ্বজগতের আবির্ভাবের পূর্বে যেটি আবশ্যক সেটি হল সত্য কথন এবং আচরণ নির্ভর পারস্পরিক বিশ্বস্ততা। তৈত্তিরীয় উপনিষদ-এ বলা হয়েছে, শাস্ত্র অনুযায়ী ঋত বিষয়ক জ্ঞান, বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কর্তব্য'। 'ঋত' শব্দের অর্থ সত্য, ন্যায়পরায়ণতা। তাই উপনিষদ মতে উপাসনার সার্থকতার জন্য জীবনে সত্য ও ন্যায় আচরণ কর্তব্য।বৈদিক সাহিত্যে বিবৃত আছে বিশ্বজাগতিক শৃঙ্খলা ঋত কর্ম নিয়মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কর্মবাদ অনুসারে কর্মের ফল বিনষ্ট হয় না। যে কর্ম করে তাকে অবশ্যই তার ফল ভোগ করতে হবে। এই নিয়ম ব্যতিক্রমহীন এবং অনিবার্য। বৈদিক যুগে কর্মবাদ অর্থে সমস্ত মানুষের জীবন ও ভৌতিক জগতের নিয়মকে বোঝানো হয়েছে। ঋক্ বেদে এই নিয়মকে 'ঋত', মীমাংসা দর্শনে একে 'অপূর্ব' এবং ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে একে 'অদৃষ্ট' বলা হয়েছে

রিয়া খেলো

প্রথম বর্ষ

ভারতীয় দর্শনে ঋণ

ভারতীয় দর্শন সত্য উপলব্ধির দর্শন যেখানে বলা হয়েছে – মানুষের জীবনের লক্ষ্য ভোগ নয়, ত্যাগ; আসক্তি নয়, অনাসক্তি। বৈদিক সাহিত্য ও সভ্যতায় ঋণ এই বিষয়টি ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের দায়বদ্ধতা এই অর্থেই গৃহীত হয়েছে। এই রূপ 'ঋণ'-এর প্রকার রূপে শাস্ত্রে 'দেবঋণ', 'ঋষিঋণ', 'পিতৃঋণ' এই ত্রিবিধ প্রকারসহ 'ভূতঋণ' এবং 'নৃঋণ'-এরও উল্লেখ আছে।

'ঋণ' শব্দটি প্রচলিত অর্থে, যা সাধারণ মানুষের কাছে জ্ঞাত অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তি তার প্রয়োজন মতো কোনো দ্রব্য দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে গ্রহণ করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই দ্রব্যটি প্রদান করে, তখন সেই দ্রব্যের বিনিময়ে প্রথম ব্যক্তিটি ঋণী হয়ে যান। ক্ষেত্রবিশেষে যেমন ঋণ পরিশোধ করলে ঋণী ব্যক্তি প্রশংসিত হন আবার ঋণ পরিশোধ না করলে নিন্দিতও হন। হিন্দু মতে প্রত্যেক মানুষ কতকগুলি ঋণ ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা নিয়েই সমাজে জন্ম গ্রহণ করে আর এই ঋণ পরিশোধ না করলে বিশ্বজাগতিক শক্তি সমূহ তার মুক্তি লাভে প্রতিবন্ধক হয়। তাই ভারতীয় দর্শন অনুসারে স্বীকৃত চতুর্বর্গ পুরুষার্থ অনুসারে মোক্ষ বা মুক্তি লাভের জন্য উল্লিখিত ঋণগুলির পরিশোধ অন্যতম প্রয়োজনীয়।

- উল্লিখিত ঋণগুলির মধ্যে প্রথম ঋণ দেবতাদের প্রতি। পূজার্চনা, হোম ও যাগযজ্ঞাদি দ্বারা ঈশ্বর আরাধনা করা এবং নিজের বর্ণ অনুসারে শাস্ত্র নির্দিষ্ট ধর্ম ও কর্মানুষ্ঠান করে দেব ঋণ পরিশোধ সম্ভব।
- ঋষিরা আমাদের জন্য যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (পুরাণ গ্রন্থ সমূহ) রেখে গেছেন, সেই ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা প্রত্যর্পণের মাধ্যমে ও বেদ ইত্যাদি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠ করে ঋষি ঋণ হতে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।
- পিতৃ ঋণ পরিশোধের জন্য গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশের পর পুত্র উৎপাদনের দ্বারা পিতৃ ঋণ পরিশোধ অবশ্য কর্তব্য। এই ঋণ পরিশোধের দ্বারা বংশ যে সংস্কৃতির ধারক তার সংরক্ষণ হয় এবং মৃত ও জীবিতদের মধ্যে বংশের যে ধারাবাহিকতা ইহা রক্ষিত হয়।
- নৃ ঋণ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব অতিথি সৎকারের মাধ্যমে। সন্ন্যাসীদের আশ্রয়, ক্ষুধার্তকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, দুঃস্থদের সেবার মাধ্যমেও নৃ ঋণের দায়ভার থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এমনটিই শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে।
- ভূত ঋণ পরিশোধের জন্য কাক ও অন্যান্য পক্ষীসহ মনুষ্যেতর জীব-জন্তুদের খাদ্য প্রদান করে এবং তাদের প্রতি যত্নবান হওয়া মানুষের অবশ্য কর্তব্য। এই প্রকার কর্তব্য পালনের দ্বারা গৃহীত ভূত ঋণ পরিশোধ সম্ভব।

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে, ব্যক্তির যে ঋণ তা কেবলমাত্র মানুষের সমাজের প্রতি সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা সমগ্র জীবের প্রতি বিস্তৃত। তাই নৈতিক ক্রিয়ার জগতের এইরূপ বিস্তার ভারতীয় নীতিবিদ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কেননা অধিকারের কথা বলার থেকে কর্তব্য পালনই ভারতীয় নীতিবিদ্যার মূল মন্ত্র।

অনুপমা বিশ্বাস
প্রাক্তন ছাত্রী